বেলুড় মঠের দুর্গা পুজো

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দ বা ১৩০৮ বঙ্গাব্দের ১লা কার্তিক ষষ্ঠীর বোধনের মধ্যে দিয়ে বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দ পরিকল্পিত ও শ্রীমা সারদা দেবীর নামে সংকল্পিত দুর্গাপুজো শুরু হয় । শ্রীমা সারদা দেবী স্বয়ং সেই পুজোর সময় বেলুড় মঠে উপস্থিত ছিলেন ।

সন্ন্যাসী-স্বামীজীরা কোন বৈদিক ক্রিয়াকলাপ করার অধিকারী নন বলেই আদর্শ গৃহস্থাশ্রমী শ্রীমায়ের নামে বেলুড় মঠের ব্রহ্মচারী দ্বারাই দুর্গাপুজো অনুষ্ঠিত হয় । স্বামীজী শ্রীমাকে জীবন্ত দুর্গা রূপে কল্পনা করতেন । তাই মৃন্ময়ী মূর্তিতে সেই চিন্ময়ী মায়েরই অধিষ্ঠান করা হয় । সেই ধারায় ১১১ বছর ধরে বেলুড় মঠের পুজো হয়ে আসছে । এই দুর্গাপুজোর অনুষ্ঠান শুদ্ধাচারে, ষোড়শপচারে, শাস্ত্রবিহিত ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে হয় বলে নৈষ্ঠিক হিন্দুদেরও শ্রদ্ধা ও ভক্তি অর্জন করেছে ।

প্রতিবছর জন্মাষ্টমীর দিন আনুষ্ঠানিকভাবে দুর্গা প্রতিমার কাঠামোটি পুজো করে প্রতিমা গড়ার প্রথম মাটি দেওয়া হয় । কারণ কথিত আছে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও মহামায়া দুর্গার আবির্ভাব একই দিনে ঘটেছে । প্রতিমা গড়া হয় প্রতি বছর একই কাঠামোর ওপর - বেলুড় মঠের প্রাঙ্গণেই। সাধারণত যে মহারাজ কাঠামো পুজো করেন, তিনিই দুর্গাপুজোর দায়িত্বে থাকেন । তন্ত্রধারক হিসেবে আর এক ব্রহ্মচারী মহারাজ । অতীতে জন্মাষ্টমী তিথি থেকেই রোজ দেবীর আবাহনের জন্য সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীদের আগমনী গান হত । বর্তমানে, প্রতিপদ তিথি অর্থাৎ মহালয়ার দিন থেকেই নাট মন্দিরে এই আগমনী গান গাওয়া হয় ।

পঞ্চমী তিথিতে কাছের জগন্নাথ দেবের মন্দির থেকে নারায়ণ-রূপী শালগ্রাম শিলা এবং শ্রীমায়ের মন্দির থেকে শিব-লিঙ্গ আনা হয় । পুজোর সময় দেবীর সঙ্গে এই মূর্তিরও যথাবিহিত পুজো ও ভোগের ব্যবস্থা হয় । দশমীতে আবার তাঁদের যথা-মন্দিরে রেখে আসা হয় । ষষ্ঠীর বোধনের দিন থেকেই সুমধুর সানাইয়ের নহবত মঠের ঐতিহ্য হয়ে উঠেছে । সঙ্গে ঢুলি পঞ্চানন হাজরার বংশধরের ঢাক-ঢোলের বাদ্যি পঞ্চাশ বছরের অবিচ্ছেদ্য অংশ ।

চারদিনের পুজোয় ফুল-ফল-নৈবেদ্য ও ভোগের সঙ্গে আরো কিছু বিশেষ জিনিসেরও প্রয়োজন হয়, উপকরণ- উপাচার হিসেবে । ব্রহ্মপুত্র নদের জল, গঙ্গার জল, শিশির জল, সুগন্ধি জল, স্বর্ণ জল, রৌপ্য জল এবং ভুবনেশ্বরের বিন্দু সরোবরের জলে দেবীর স্নানাভিষেক হয়।

... ২

নানা জায়গার মাটি যেমন গজদন্ত মৃত্তিকা, বরাহদন্ত মৃত্তিকা, অশ্বদন্ত মৃত্তিকা, চতুষ্পথ মৃত্তিকা, গঙ্গা মৃত্তিকা, দেবদ্বার মৃত্তিকা, রাজদ্বার মৃত্তিকা, বেষ্যাদ্বার মৃত্তিকা, যজ্ঞশালা মৃত্তিকা, বল্মীক মৃত্তিকা, বৃষশৃঙ্গ মৃত্তিকা, পর্বত মৃত্তিকা, গোষ্ঠ মৃত্তিকার সঙ্গে নদ-নদী, সরোবর-সাগরের মৃত্তিকাও ব্যবহৃত হয় এই পুজোয়। শ্রীমায়ের আপত্তিতে পশুবলির বদলে আখ, শশা, চালকুমড়া ও কলা বলি প্রদত্ত হয়।

বেলুড় মঠের প্রথম পুজোয় স্বামী বিবেকানন্দ স্বয়ং নয়জন কুমারীকে পুজো করেন। এই সব জীবন্ত প্রতিমার চরণে অঞ্জলি ও হাতে মিষ্টান্ন, দক্ষিণা প্রদান করে প্রণাম করেন। বর্তমানে মহাষ্টমীর দিন পাঁচ থেকে সাত বছরের একটি কুমারীকে দুর্গাপ্রতিমার পাশে দেবীজ্ঞানে পুজো করা হয়। একটি কুমারীকে দুর্গাজ্ঞানে পুজো করে সকলের মধ্যেই মাতৃভাবের সঞ্চার করা হয়।

স্বামী বিবেকানন্দের বহুজনহিতায় সেবাধর্ম ও কর্মকান্ডের উদ্যোগ ছিল সর্বজনবিদিত। তাই বেলুড় মঠের দুর্গাপুজোয় আপামর জনসাধারণের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ একটি ঐতিহ্যপূর্ণ অনুষ্ঠান। প্রথম পুজোর সময় দিনে প্রায় ৪ হাজার মানুষ প্রসাদ পেয়েছিলেন। তখনকার দিনে ধনী-দরিদ্র, ভিখারী, অনাথ-আতুর সবাই একসঙ্গে বসে প্রসাদ গ্রহণ করতেন। এ ব্যাপারে পঞ্চাশের মন্বন্তরেও ছেদ পড়েনি। সেবার পুজোর খরচ কম করেও দুঃস্থ-বুভুক্ষু, সর্বহারা নর-নারায়ণদের মধ্যে শাক-সবজি সহ খিচুরি পরিবেশনের মধ্যেই মঠের পুজো সার্থক করেন। এখন, লক্ষাধিক ভক্ত ও দর্শনার্থী সমাগম হয় এই পুজোয়। এর মধ্যে বিদেশীরাও সংখ্যায় যথেষ্ট। পুজোর খরচ সংগৃহীত হয় জনসাধারণের প্রণামী-দানের মধ্যেই। এবং আজও জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে লক্ষ লক্ষ মানুষ পুজোর প্রসাদ পান।

দশমীর সন্ধ্যায় পূজক ও তন্ত্রধারক মহারাজদের দর্শনীয় সন্ধ্যারতির শেষে শ্রীমায়ের ঘাটে জাহ্নবী সলিলে প্রতিমা নিরঞ্জন করা হয়। সবশেষে শ্রীরামকৃষ্ণের মন্দিরে দেবীর আশীর্বাদ-পূত শান্তিজল দেওয়া হয়। পরস্পরের সঙ্গ আলিঙ্গন ও প্রণাম বিনিময়ের পরে মিষ্টি বিতরণ করা হয়। তখন প্রতিমা-শিল্পী, ঢাকি-ঢুলি প্রভৃতিদের কাপড়, প্রসাদ, টাকা দিয়ে বিদায় জানানো হয়। গৃহী ও সন্ন্যাসীর এই মিলন মেলার মধ্যে ই মঠের দুর্গাপুজোর সমাপ্তি ঘটে।

আজও স্বামীজী-ব্রহ্মচারীদের অর্চনায় আনন্দময়ীর পুজোর যে প্রভূত আনন্দ ও ভাব উদ্দীপিত হয়, সাধারণ মানুষের মধ্যেও তার সঞ্চার হয়। দেবীর মৃন্ময়ী রূপটি নিমজ্জিত হলেও - মাতৃরূপেন সংস্থিতা - মাতৃভাবের চিন্ময়ী রূপটি সকলের অন্তরে বিরাজিত থাকে।

দ্রষ্টব্য : 'বেলুড় মঠে স্বামীজীর দুর্গাপূজা' - স্বামী দেবেন্দ্রানন্দ - উদ্বোধন